ছিন্নপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রতিভা

ছিন্নপত্র

পত্র ১

বন্দোরা সমুদ্রতীর
[২৪ জুন ১৮৮৬?]

ভারি বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। এক সপ্তাহ ধরে ক্রমাগতই বৃষ্টি। এখনো বিরামের লক্ষণ নেই। আমার বারান্দার কাঁচের জানালা সমস্ত বন্ধ ক'রে চুপ মেরে বসে আছি। নিতান্ত মন্দ লাগছে না, আপনাতে আপনি বেশ একরকম আচ্ছন্ন হয়ে আছি— কোনো প্রকার emotion এর প্রাবল্য নেই—ঝড়-ঝঞ্ঝা যা-কিছু সমস্তই বাহিরে। অসহায় অনাবৃত সমুদ্র ফুলে ফুলে ফেনিয়া ফেনিয়ে সাদা হয়ে উঠছে। সমুদ্রকে দেখে আমার মনে হয় কী একটা প্রকাণ্ড অন্ধ শক্তি বাঁধা প'ড়ে আস্ফালন করছে— আমরা নিশ্চিন্ত মনে তীরে দাঁড়িয়ে আছি— সমুদ্রের বিস্ফারিত গ্রাসের মুখেই আমরা ঘরবাড়ি বেঁধে বসে আছি! আমরা যেন সিংহের কেশর ধরে টানছি, অথচ অসহায় সিংহ কিছু বলতে পারছে না— একবার যদি সমস্ত সমুদ্র ছাড়া পায় তা হলে আমাদের আর চিহ্নমাত্র থাকে না। খাঁচার মধ্যে বাঘ তার লেজ আছড়াচ্ছে, আমরা কেবল দু হাত তফাতে দাঁড়িয়ে হাসছি। একবার চেয়ে দেখুন কী বিপুল বল। তরঙ্গগুলো যেন দৈত্যের মাংসপেশীর মতো ফুলে উঠছে। পৃথিবীর সৃষ্টির আরম্ভ থেকে এই ডাঙার জলে লড়াই চলছে— ডাঙা ধীরে ধীরে নীরবে এক-এক পা ক'রে আপনার অধিকার বিস্তার করছে, আপনার সন্তানদের ক্রমেই কোল বাড়িয়ে বাড়িয়ে দিচ্ছে— আর পরাজিত সমুদ্র পিছু হটে হটে কেবল ফুঁসে ফুঁসে বক্ষে করাঘাত করে মরছে। মনে রাখবেন এক কালে সমুদ্রের একাধিপত্য ছিল— তখন সে সম্পূর্ণ মুক্ত। ভূমি তারই গর্ভ থেকে উঠে তার সিংহাসন কেড়ে নিয়েছে, উন্মাদ বৃক্ষ সমুদ্র তার শুভ্র ফেনা নিয়ে King Lear[১]-এর মতো ঝড়ে ঝঞ্ঝার অনাবৃত আকাশে কেবল বিলাপ করছে।

---

১ শেকসপিয়ার রচিত ট্রাজেডি। রাজ্য-সিংহাসনছিন্ন, সন্তানহারা লিয়ারের ভয়ংকর বিলাপ উপমান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

পত্র ২

সোলাপুর
তারিখ ঠিক জানি নে
অক্টোবর ১৮৮৫
সোমবার

আপনি তো সব-ডেপুটি সাহেব[১]—বন্যার মুখে বাংলা মুল্লুকে ভেসে বেড়াচ্ছেন— আমরা কলকাতায় যাচ্ছি সে খবর রাখেন কি? এই চিঠি এবং আমরা শুক্রবারের সকালের ডাকে কলিকাতায় বিলি হব। আমাদের প্রবাসের পালা সাঙ্গ করলুম— এখানকার অগাধ আকাশ, অগাধ বাতাস, উদার মাঠ, বিমল শান্তি, এসব পশ্চাতে রেখে সেই বাঁশতলার গলি, জোড়াসাঁকোর মোড়, সেই ছেক্‌ড়া গাড়ির আস্তাবল, সেই ধুলো, সেই ঘড়ুঘড়ু-হুড়ুমুড়ু-হৈ হৈ, সেই মাছি-ভন্‌ভন্‌ ময়রার দোকান, সেই ঘোরতর হিজিবিজি হ-য-ব-র-ল'র মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জন করতে চললুম। সেখানে তিন হাজার গির্জের চুড়ো, কলের চিমনি, জাহাজের মাস্তুল নীল আকাশে যেন গুঁতো মারতে উঠেছে; কলকাতা তার সমস্ত লোষ্ট্রকাষ্ঠ দিয়ে প্রকৃতিকে গঙ্গা পার করেছে— তার উপরে আবার এক পাঁচিল-দেওয়া নিমতলার ঘাট, মানুষের মরেও সুখ নেই। এখানে আমরা ক'জনে মিলে অশোক-কাননের নীড়ের মধ্যে ছিলুম, সেখানে এক প্রকার ইঁটের খাঁচার মধ্যে প্রবেশ করতে চললুম। সেখানকার সেই লক্ষ লক্ষ কয়েদির সঙ্গে municipality'র দুর্গের মধ্যে বন্দী হতে চললুম। শুনে সুখী হলেন তো?

এতদিন ভুলে ছিলেম, কিন্তু আজ আবার আমার সেই পর্দা-টানা ঘোমটা-দেওয়া ঘরটি মনে পড়ছে। কিন্তু কোথায় আপনি, কোথায় আপনার সেই ছাতা, পাপোশ-শয্যায় শয়ান সেই পুরাতন জুতোযুগল! আমার সেই হৃষ্টপুষ্ট বিরহিণী তাকিয়া— সে কি আমাদের বিরহে রোগা হয়ে গেছে, আমি তাই ভাবছি। আমার বইগুলো কাঁচের অন্তঃপুর থেকে চেয়ে আছে— কিন্তু কার দিকে চেয়ে আছে? আমার শূন্যহৃদয়া চৌকি দিনরাত্রি তার দুই বাহু বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু এখন তার এই নীরব আহ্বান কেউ গ্রাহ্য করে না। আমার সেই ঘড়িটা টিক্‌ টিক্‌ করছে, সে বড়ো একটা কাউকে খাতির করে না, সে কেবল সময়ের পদচিহ্নের হিসেব রাখতেই ব্যস্ত। কিন্তু আমার সেই হার্মোনিয়ম! সে আপনার নীরব সংগীতের উপর বনাত মুড়ি দিয়ে ভাবছে, ঘড়িটা ব্রাকেটের উপরে দাঁড়িয়ে মিছেমিছি তাল দিয়ে মরছে কেন? দেয়ালগুলো তাকিয়ে আছে— ভাবছে, ঘরের প্রধান আসবাবটা গেল কোথায়? কলকাতার সেই জনতাসমুদ্রের মধ্যে আমার সেই বিরহান্ধকার ঘরটিই কেবল বিজন। তার সেই রুদ্ধ দ্বারের ভিতর থেকে

কাতর স্বর উঠছে, রবি বাবু—উ—উ—উ। রবিবাবু আজ এখান থেকে সাড়া দিচ্ছেন, এই যা—আ—আ—ই।

কলকাতায় ফিরে গিয়ে কি আর আপনার সঙ্গে দেখা হতে পারে না? আপনি কি এখন ইহজন্মের মতো সব-ডেপুটিপুরে প্রয়াণ করলেন? শীঘ্র আর মুক্তির ভরসা নেই? আইনের গলগ্রহ গলায় বেঁধে আপনি কি তা হলে সর্বিস-সরোবরে একরকম ডুব মারলেন? যাক, তা হলে আপনার আশা একেবারে পরিত্যাগ করে আমরা আশমানে বিহার করি আর বলাবলি করি, 'আহা, শ্রীশবাবু লোকটা ছিলেন ভালো।'

---

১. শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (১৮৬০-১৯০৮)। জন্ম : বর্ধমানের ন-পাড়া গ্রামে। ১৮৮৫ সালে সাব-ডেপুটি পদে যোগ দেন। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের আজীবন সুহৃদ ও বন্ধু।

পত্র ৩

১৭ এপ্রেল ১৮৮৬

সাব-ডেপুটি সা'ব,

গয়াধামে[১] আপনি গমন করেছেন, এখন আমার কী গতি করে গেলেন? আপনার দর্শন আমার নিয়মিত বরাদ্দের মতো হয়ে গিয়েছিল, এখন তার থেকে বঞ্চিত হয়ে আমি মৌতাতহীন অহিফেন-সেবীর মতো ছট্‌ফট্‌ করছি। বাস্তবিক, আপনি আমাকে অহিফেনই ধরিয়েছেন বটে। আপনি এসে নানা কৌশলে আমাকে গোটাকতক ছোটো ছোটো কল্পনার গুলি গেলাতেন, আমার স্বপ্ন জাগিয়ে তুলতেন, আমাকে আমারই প্রভাতসংগীত-সন্ধ্যাসংগীতের মধ্যে আচ্ছন্ন করে ফেলতেন, আমি চোখ বুজে আনন্দে আমার নিজের মধ্যে প্রবেশ করে বসে থাকতুম এবং সেইখান থেকে নেশার ঝোঁকে স্বগত উক্তি প্রয়োগ করতুম, আপনি শুনে মনে মনে হাসতেন। আফিমের নেশা একেই বলে। আত্মম্ভরিতার মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে নিজের স্বপ্নে ভোর হওয়াকেই বলে আফিমের নেশা। আপনি সেই নেশাটাই আমাকে অভ্যেস করিয়েছেন। আপনি প্রায় আপনার নিজের কথা বলতেন না, উল্‌টে পাল্‌টে আমারই কবিতা, আমারই লেখা, আমারই কথার মধ্যে আমাকে টেনে নিয়ে ফেলতেন— আমাকে খুব মাতিয়ে রেখেছিলেন যা হোক! ইংরেজেরা বর্মায় চীনে আফিম ঢুকিয়েছে, আপনি আমার সেই অয়েল্‌ক্লথ-মণ্ডিত ক্ষুদ্র ঘরটির মধ্যে গোপনে অলক্ষ্যে আফিমের ব্যবসা প্রবেশ করিয়েছেন— আপনি সহজ লোকটি নন। কিন্তু একবার আফিম ধরিয়ে আপনি কৌটা-সমেত কোথায় অন্তর্ধান হলেন? আমি মৌতাত-বিরহে এই দুরন্ত গ্রীষ্মে একলা ঘরে বসে দু বেলা হাই তুলছি এবং গা-মোড়া দিচ্ছি। নিদেন, আমার দ্বারের পার্শ্বে আপনার সেই পরিচিত ছাতিটা জুতোটা রেখে গেলেও আমার কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা ছিল। আপনার পত্রপাঠে অবগত হলেম আপনি শ্রীগয়াধামে আপনার প্রেতপুরীতে মনুষ্যাভাবে নিতান্ত কাতর আছেন, কিন্তু আপনার কাজ আপনার সঙ্গী, অর্থাৎ আপনি আছেন এবং আপনার চিরসঙ্গী 'সাব-ডেপুটি' আপনার ছায়ার মতো সঙ্গে আছেন। সে সঙ্গীকে এখনো আপনার তেমন ভালো লাগছে না, কিন্তু ক্রমে তার প্রতি প্রীতি জন্মানো কিছু অসম্ভব নয়।

আমি ব্যক্তির হাতে এখন কোনো কাজকর্ম নেই— চাপকানের বোতামগুলো খুলে দেহ এলিয়ে এখন গায়ে বাতাস লাগাচ্ছি, সৌভাগ্যক্রমে এখন অহিফেনের ততটা দরকার বোধ হচ্ছে না। আমার তাকিয়ার মধ্যে স্বপ্ন পোষা রয়েছে— সেটা একটা স্বপ্নের বৃহৎ ডিবের মতো বোধ হচ্ছে, তার উপরে

মাথা রাখলেই মাথার মধ্যে হু হু করে নেশা প্রবেশ করে। এতদিন মাথার উপরে 'বালক' কাগজের বোঝাটা থাকাতেই মাথা যেন রুদ্ধ হয়ে ছিল, নেশা একেবারে ছুটে গিয়েছিল— এখন সমস্ত খোলাসা— দক্ষিণে বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা যেন চারদিকে উড়ে বেড়াচ্ছে।

এ সময়ে আমাকে যদি একটা বাগান দিতে পারতেন । নদীর তীর, গাছের ছায়া, মাঠের বাতাস, আমের বোল, কোকিলের কুহু, বসন্তী রঙের চাদর, বকুল ফুলের মালা, এবং সেইসঙ্গে আপনাকেও চাচ্ছি! কলকাতা শহর, পোলিটিকেল এজিটেশন, বসন্তকালে এ তো সহ্য হয় না। কোথায় আপনার বাগান শ্রীশবাবু, কোথায় আপনি? সংস্কৃত কবি বলেছেন—

সংগমবিরহবিকল্পে বরমপি বিরহো ন সংগমস্তস্যাঃ।
সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে।।

ভাবার্থ : সংগম এবং বিরহের মধ্যে বরং বিরহ ভালো, তবু সংগম কিছু না— কারণ, মিলনের অবস্থায় সে একা আমার কাছে থাকে মাত্র, আর বিরহাবস্থায় ত্রিভুবন তাতেই পুরে যায়। কিন্তু ভট্‌চার্য মশায়ের সঙ্গে আমার মতের মিল হল না— আপনার বিরহে আমার এইরকম মনে হচ্ছে যে, ত্রিভুবনময় শ্রীশবাবুর ঝাঁক থাকার চেয়ে হাতের কাছে একটা শ্রীশবাবু থাকা ভালো। ইরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, ঝোপের মধ্যে গণ্ডাখানেক পাখি থাকার চেয়ে মুঠোর মধ্যে একটা পাখি থাকা ঢের ভালো। এ সম্বন্ধে আমি এই ইংরেজের মতো practical view নিয়ে থাকি। আপনি কী বলেন আমি জানতে ইচ্ছে করি।

---

১. বিহার রাজ্যের পাটনা বিভাগের একটি জেলা। মহাভারতে গয়াকে 'গয়াপুরী' বলে উল্লেখ করা
হয়েছে। এই জেলা সুপ্রাচীন ইতিহাস সমৃদ্ধ। গয়া হিন্দুদের পবিত্র তীর্থকেন্দ্র। এখানে হিন্দুরা মৃতের আত্মার সদ্‌গতির জন্য পিণ্ডদান করেন।

পত্র ৪

৭ মে ১৮৮৬

ইতিমধ্যে একদিন গো— বাবুদের ওখানে যাওয়া গিয়েছিল। সেখানে আমি আপনার 'বাঙ্গালার বসন্তোৎসব'[১]এর কথা পাড়লুম, আশ্চর্য হলুম, তাঁরাও সকলে একবাক্যে আপনার এই লেখার প্রশংসা করলেন। আশ্চর্য হবার কারণ এই যে, ভালো লাগা এক, এবং ভালো বলা এক। ভালো জিনিস সহজেই ভালো লাগে, তর্কবিতর্ক যুক্তিবিচার করে ভালো লাগে না— কিন্তু সমালোচনা করবার সময়ে মনের মধ্যে এমনি তর্কবিচারের প্রাদুর্ভাব হয় যে, খপ্ করে একটা জিনিসকে ভালো বলা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার হয়ে ওঠে। তখন মনে হয়, যে লেখাটা পড়লুম সেটা লিখছে কে, তাতে আছে কী, তাতে নূতন কথা বলা হয়েছে কি, এইরকম লেখাকে সমালোচকেরা কী বলে থাকে, এ কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং তার পরে দেখতে দেখতে দলে দলে 'যদি' 'কিন্তু' 'কী জানি' 'হয়তো' প্রভৃতি সহস্র রক্তশোষকের আমদানি হয়। তাঁরা চতুর্দিকে তিন ক্রোশের মধ্যে রসকষ কিছুই অবশিষ্ট রাখেন না। 'ভালো লাগা' জিনিসটি এমনি কোমল সুকুমার যে, ভালো লেগেছে কি না এই সহজ সত্যটুকু ঘটা করে প্রমাণ করতে বসলে সে ব্যক্তি যায়-যায় হয়ে ওঠে। সমালোচকেরা আপনার বিরুদ্ধে আপনি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে থাকে, ভালো লাগলেও তারা যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করে দেয় যে ভালো লাগে নি। এই গেল সমালোচনাতত্ত্ব। যা হোক, আপনার বহিটা শেষ হয়ে গেলে সাধারণ পাঠকদের কিরকম লাগে জানতে ইচ্ছে রইল। হয়তো বা ভালো লাগতেও পারে। ভালো লাগবার একটা কারণ এই দেখছি, আপনি আপনার কেতাবের মধ্যে আমাদের চিরপরিচিত বাংলাদেশের একটি সজীব মূর্তি জাগ্রত করে তুলেছেন, বাংলার আর কোনো লেখক এতে কৃতকার্য হন নি। এখনকার অধিকাংশ বাংলা বই পড়ে আমার এই মনে হয় যে, আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের সময় বাংলাদেশই ছিল কি না ভবিষ্যতে এ নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। আপনি হয়তো শুনে থাকবেন কোনো মার্কিন-দেশীয় ভাষাতত্ত্ববিদ্ বলেন, পাণিনি যে ভাষার ব্যাকরণ সে ভাষাই কোনো কালে ছিল না– তিনি দেখেছেন পাণিনিতে এমন অনেক ধাতু প্রভৃতি পাওয়া যায় সমস্ত সংস্কৃত ভাষায় যা খুঁজলে মেলে না। এইরূপ নানা কারণে তিনি ঠিক করে রেখেছেন যে, পাণিনি-ব্যাকরণটি এমন একটি ঘোড়ার ডিম যা কোনো ঘোড়ায় পাড়ে নি। অনেক ভাষা আছে যার ব্যাকরণ এখনো তৈরি হয় নি, কিন্তু কে জানত এমন ব্যাকরণ আছে যার ভাষা তৈরি হয় নি! এই ঘটনায় আমার মনে হয়েছে,

ভবিষ্যতে এমন একজন তত্ত্বজ্ঞের প্রাদুর্ভাব হতে পারে যিনি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে দিতে পারবেন যে, বাংলা সাহিত্য যে দেশের সাহিত্য সে দেশ মূলেই ছিল না– তখন বঙ্কিমবাবুর এত সাধের 'সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং' পুরাতত্ত্বের গবেষণার তোড়ে কোথায় ভেসে যাবে। পণ্ডিতেরা বলবেন, বঙ্গসাহিত্য একটা কলেজের সাহিত্য, এটা দেশের সাহিত্য নয়– কিন্তু সে কলেজটা ছিল কোথায় এ বিষয়ে কিছুই মীমাংসা হবে না। আপনার সেই লেখাটির মধ্যে বাংলাদেশের সন্ধান পাওয়া যায়, ভারতবর্ষের পূর্ব-বিভাগের জিয়োগ্রাফির প্রতি বিশ্বাস জন্মায়। আপনার সেই লেখার মধ্যে অধিকাংশ স্থলে বাংলার ছেলেমেয়েরা কালেজি কথা কয় না ও কালেজি কাজ করে না, তারা প্রতিদিন গৃহের মধ্যে যে রকম কথা কয় ও যেরকম কাজ করে তাই দেখতে পাওয়া যায়। অন্য কারও অথবা ক্ষুদ্র আমার লেখায় সেইটি হবার জো নেই। কিন্তু আপনাকে আর অহংকৃত করা হবে না, অতএব এখানেই সমালোচনায় ক্ষান্ত হলুম।

---

১ প্রকাশ : চৈত্র সংখ্যা 'বালক'-এর (১২৯৩) ৫৬২-৬৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত।

পত্র ৫

[জুন?] ১৮৮৮

আপনার চিঠি এইমাত্র পেলুম, বেলা দশটা বেজে গেছে। বাহিরে অসহ্য উত্তাপ, আমাদের ঘরের সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ—অন্ধকার—মাথার উপরে পাখা আনাগোনা করছে; আর্দ্র খস্‌খস্‌ ভেদ করে প্রচণ্ড পশ্চিমপবন শীতল ভাবে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করছে। ঘরের মধ্যে একরকম আছি ভালো! সেই পুরাতন ডেস্কের উপর ঝুঁকে পড়ে চিঠি লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছি।—আপনার 'ফুলজানি'[১] আমি পূর্বেই ভারতীতে পড়েছি এবং পড়েই আপনাকে একটা চিঠি লিখব মনে করেছিলুম। তার পরে ভাবলুম আপনি একেই তো চিঠির উত্তর বহু বিলম্বে দেন, তার পর যদি বিনা উত্তরেই চিঠি লিখি তবে আপনাকে অত্যন্ত আশ্‌কারা দেওয়া হয়। এরকম ব্যবহার পেলে বন্ধুদের স্বভাব খারাপ হয়ে যায়। তাই নিবৃত্ত হলুম। আপনার লেখা আমার ভারি ভালো লাগে। ওর মধ্যে কোনোরকম নভেলি মিথ্যা ছায়া নেই। আর এমন একটি ছবি মনে এনে দেয় যা আমাদের দেশের কোনো লেখকের লেখাতে দেয় না। আপনি কোনোরকম ঐতিহাসিক বা ঔপদেশিক বিড়ম্বনায় যাবেন না—সরল মানবহৃদয়ের মধ্যে যে গভীরতা আছে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখদুঃখপূর্ণ মানবের দৈনন্দিন জীবনের যে চিরানন্দময় ইতিহাস তাই আপনি দেখাবেন। শীতল ছায়া, আম-কাঁঠালের বন, পুকুরের পাড়, কোকিলের ডাক, শান্তিময় প্রভাত এবং সন্ধ্যা, এরই মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে, তরল কলধ্বনি তুলে, বিরহমিলন হাসিকান্না নিয়ে যে মানবজীবনস্রোত অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হচ্ছে তাই আপনি আপনার ছবির মধ্যে আনবেন। প্রকৃতির শান্তির মধ্যে, স্নিগ্ধচ্ছায়া শ্যামল নীড়ের মধ্যে যে-সব ছোটো ছোটো হৃদয়ের ব্যাকুলতা বাস করছে, দোয়েল কোকিল বউকথাকও'এর গানের সঙ্গে মানবহৃদয়ের যে-সকল আকাঙ্ক্ষাধ্বনি মিশ্রিত হয়ে অবিশ্রাম আকাশের দিকে উঠছে, আপনার লেখার মধ্যে সেই ছবি এবং সেই গান মেশাবেন। কোনোরকম জটিলতা বা চরিত্রবিশ্লেষণ বা দুর্দান্ত অসাধারণ হৃদয়াবেগ এনে স্বচ্ছ মধুর শান্তিময় ঘটনাস্রোতকে ঘোলা করে তুলবেন না। আমার বিশ্বাস, আপনি যদি অধিক ফলাও কাণ্ড না করেন, তা হলে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস-লেখকের সঙ্গে সমান আসন পেতে পারবেন। বাংলার অন্তর্দেশবাসী নিতান্ত বাঙালিদের সুখ-দুঃখের কথা এ পর্যন্ত কেহই বলেন নি— আপনার উপর সেই ভার রইল। বঙ্কিমবাবুর ঊনবিংশ শতাব্দীর পোষ্যপুত্র আধুনিক বাঙালিদের কথা যেখানে বলেছেন সেখানে কৃতকার্য হয়েছেন, কিন্তু যেখানে পুরাতন বাঙালির কথা বলতে

গিয়েছেন সেখানে তাঁকে অনেক বানাতে হয়েছে; চন্দ্রশেখর প্রতাপ প্রভৃতি কতকগুলি বড়ো বড়ো মানুষ এঁকেছেন। (অর্থাৎ তাঁরা সকল-দেশীয় সকল-জাতীয় লোকই হতে পারতেন, তাঁদের মধ্যে জাতি এবং দেশকালের বিশেষ চিহ্ন নেই) কিন্তু বাঙালি আঁকতে পারেন নি। আমাদের এই চিরপীড়িত, ধৈর্যশীল, স্বজনবৎসল, বাস্তুভিটাবলম্বী, প্রচণ্ডকর্মশীল-পৃথিবীর-এক-নিভৃত-প্রান্ত বাসী শান্ত বাঙালির কাহিনী কেউ ভালো করে বলে নি।

---

১ ফুলজানি। ১৩০০ সাল। 'ভারতী ও বালক' পত্রে ১২৯৫-৯৬ সালে প্রকাশিত হয়। দ্রঃ 'আধুনিক সাহিত্য', ঐতিহ্য *রবীন্দ্র-রচনাবলি*, দশম খণ্ড।

পত্র ৬

[ফেব্রুয়ারি?] ১৮৮৭

মাভৈঃ মাভৈঃ। সপ্তাহের পর সপ্তাহ আসবে কিন্তু 'সপ্তাহ'[১] আর বের হবে না। অতএব বন্ধুবান্ধবেরা সকলে নিশ্চিন্ত হউন। ভেবে দেখুন কী করতে বসেছিলুম। সপ্তাহ বের করবার ছল করে জীবন থেকে সপ্তাহগুলো একেবারে লোপ করতে বসেছিলুম। এখন যেমন আমি সপ্তাহে সাতটা দিন করে পাই তখন সপ্তাহে সাতটা দিন বাদ পড়ত। মাসের পর মাস আসত, কিন্তু সপ্তাহ নেই; দিনগুলো আমাকে লাঠি হাতে তাড়া করে বেড়াত। আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াব ভেবে পেতুম না। হরিশ্চেন্দ্র যেমন বিশ্বামিত্রকে সমস্ত পৃথিবী দান করে বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন, অবশেষে স্বর্গটা পর্যন্ত অদৃষ্টে জুটল না, আমিও তেমনি আমার সমস্ত সময় পরের হাতে দিয়ে অবশেষে স্বর্গ পর্যন্ত খোয়াতুম– কারণ, খবরের কাগজ লিখে এ পর্যন্ত কেউ অমরলোক প্রাপ্ত হয় নি। এই বসন্তকাল এসেছে, দক্ষিণের হাওয়া বয়েছে, এ সময়টা একটু-আধটু গান-বাজনার সময়–এ সময়টা যদি কেবলই রুশ, চীন, পাঠানের অরাজকত্ব, মগের মুল্লুক, আব্‌কারি ডিপার্টমেন্ট্, লুনের মাশুল, তাকের খবর এবং পৃথিবীর যত শয়তানের প্রতি নজর রাখতে হয় তা হলে তো আর বাঁচি নে। পৃথিবীর গুপ্তচর হয়ে বেঁচে কোনো সুখ নেই। জীবনে তো বসন্তকাল বেশি আসে না। যতদিন যৌবনে ততদিন গোটাকতক বসন্ত হাতে পাওয়া যায়– সে কটা না খুইয়ে মনে করছি বুড়োবয়সে একটা খবরের কাগজ খুলব; তখন হয়তো প্রাণ খোলা নেই, গান বন্ধ, সেই সময়টা ভাঙা গলায় পলিটিক্‌স্ প্রচার করা যাবে। এখনো অনেক কথা বলা বাকি আছে, সেগুলো হয়ে যাক আগে। কী বলেন?–আপনার চিঠিতে রাণী শরৎসুন্দরীর[২] বিবরণ পড়ে আমার বড়ো ভালো লাগল। আপনি তাঁর স্নেহ ভোগ করেছেন এ আপনার নিতান্ত সৌভাগ্যের কথা। তাঁর জীবন-সম্বন্ধে কিছু লিখলে ভালো হয়। আমাদের মহদ্‌দৃষ্টান্ত নানা কারণে আমাদের নজরে পড়ে না, সেগুলো যাতে আমাদের দৃষ্টিপথে পড়ে সে চেষ্টা করা উচিত।

---

১ 'সপ্তাহ'-নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশের আয়োজন উপলক্ষে লিখিত।

২ শরৎসুন্দরী রাজশাহী জেলার পুঠিয়ার মানবহিতৈষী ও মহানুভব রানী।

পত্র ৭

অক্টোবর ১৮৮৭

আমি প্রায় এক মাস কাল দার্জিলিঙে কাটিয়ে এলুম। আপনার পত্র কলকাতায় আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। আমি ফিরে এসে পেলুম। আপনাকে অনেক দিন থেকে লিখি-লিখি করছি, কিন্তু দৈব-বিপাকে হয়ে ওঠে নি। এবার আমার ততটা দোষ ছিল না। আমার কোমরে বাত হয়ে কিছুকাল শয্যাগত হয়ে পড়েছিলুম, এখনো ভালো করে সারি নি। তবে এখন বিছানা থেকে উঠে বসেছি। কিন্তু বেশিক্ষণ চৌকিতে বসে থাকতে পারি নে। আমার কোমর ছাড়া পৃথিবীতে আর আর সমস্ত মঙ্গল। আমার স্ত্রী কন্যা দার্জিলিঙে, আমি কলকাতায় ঘরে বসে বিরহ ভোগ করছি– কিন্তু বিরহের চেয়ে কোমরের বাতটা বেশি গুরুতর বোধ হচ্ছে। কবিরা যাই বলুন, আমি এবার টের পেয়েছি বাতের কাছে বিরহ লাগে না। কোমরে বাত হলে চন্দনপঙ্ক লেপন করলে দ্বিগুণ বেড়ে ওঠে, চন্দ্রমাশালিনী পূর্ণিমাযামিনী সান্ত্বনার কারণ না হয়ে যন্ত্রণার কারণ হয়, আর স্নিগ্ধ সমীরণকে বিভীষিকা বলে জ্ঞান হয়– অথচ কালিদাস থেকে রাজকৃষ্ণ রায় পর্যন্ত কেউই বাতের উপর এক ছত্র কবিতা লেখেন নি, বোধ হয় কারও বাত হয় নি। আমি লিখব। এই প্রসঙ্গে আমি আপনাকে একটা তত্ত্বের মীমাংসা জিজ্ঞাসা করি– বিরহের কষ্টই বা কেন কবিতার বিষয়, আর বাতের কষ্টই বা কেন কবিতার বিষয় নয়? কোমরটাকে যত সামান্য বোধ হত এখন তো তত সামান্য বোধ হয় না। হৃদয় ভেঙে গেলেও মানুষ মাথা তুলে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে– কিন্তু কোমর ভেঙে গেলেই মানুষ একেবারে কাৎ, তার আর উত্থানশক্তি থাকে না। তখন প্রেমের আহ্বান, স্বদেশের আহ্বান, সমস্ত পৃথিবীর আহ্বান এলেও সে কোমরে টার্পিন তেল মালিশ করবে। যতদিন মানুষের কোমর না ভাঙে ততদিন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণশক্তি মানুষ ঠিক অনুভব করতে পারে না– আপনি কেতাবে পড়েছেন কিন্তু তবুও জানেন না যে, জননী বসুন্ধরা ক্রমাগতই আমাদের মধ্যদেশ ধরে আকর্ষণ করছেন, বাত হলেই তবে তাঁর সেই মাতৃস্নেহের প্রবল টান সবিশেষ অনুভব করা যায়। যা হোক শ্রীশবাবু, বন্ধুর দুর্দশা অবধান করে কোমরকে আর কখনো হেয়জ্ঞান করবেন না– কপাল ভাঙা সে তো রূপক মাত্র, কিন্তু কোমর ভাঙা অত্যন্ত সত্য, তাতে কল্পনার লেশমাত্র নেই। সেই সত্য, বর্তমান কালে অত্যন্ত অনুভব করছি বলে আপনাকে আর চিঠি লিখতে পারছি নে। বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে আপনি প্রশ্ন করেছেন, সে বিষয় পরে উত্থাপন করা যাবে; আপাতত এই বলে রাখছি, বাল্যবিবাহ যে ইচ্ছে করুক, কিন্তু কোমরে বাত যেন কারও না হয়।

পত্র ৮

২৭ জুলাই ১৮৮৭

বহুদিন চিঠিপত্র লিখি নি, কারণ চিঠি লেখা কম কাণ্ড নয়। দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে, কেবল বয়স বাড়ছে। দু বৎসর আগে পঁচিশ ছিলুম, এইবার সাতাশে পড়েছি—এই ঘটনাটাই কেবল মাঝে মাঝে মনে পড়ছে, আর কোনো ঘটনা তো দেখছি নে। কিন্তু সাতাশ হওয়াই কি কম কথা! কুড়ির কোঠার মধ্যাহ্ন পেরিয়ে ত্রিশের অভিমুখে অগ্রসর হওয়া। ত্রিশ, অর্থাৎ ঝুনো অবস্থা। অর্থাৎ যে অবস্থায় লোকে সহজেই রসের অপেক্ষা শস্যের প্রত্যাশা করে— কিন্তু শস্যের সম্ভাবনা কই? এখনো মাথা নাড়া দিলে মাথার মধ্যে রস থল্ থল্ করে— কই, তত্ত্বজ্ঞান কই? লোকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করছে, 'তোমার কাছে যা আশা করছি তা কই? এতদিন আশায় আশায় ছিলুম, তাই কচি অবস্থার শ্যাম শোভা দেখেও সন্তোষ জন্মাত, কিন্তু তাই বলে চিরদিন কচি থাকলে তো চলবে না। এবারে, তোমার কাছে কতখানি লাভ করতে পারব তাই জানতে চাই— চোখে-ঠুলি-বাঁধা নিরপেক্ষ সমালোচকের ঘানি-সংযোগে তোমার কাছ থেকে কতটুকু তেল আদায় হতে পারে এবার তার একটা হিসেব চাই।' আর তো ফাঁকি দিয়ে চলে না। এতদিন বয়স অল্প ছিল, ভবিষ্যৎ সাবালক অবস্থার ভরসায় লোকে ধারে খ্যাতি দিত। এখন ত্রিশ বৎসর হতে চলল, আর তো তাদের বসিয়ে রাখলে চলে না। কিন্তু পাকা কথা কিছুতেই বেরোয় না শ্রীশবাবু! যাতে পাঁচজনের কিছু লভ্য হয় এমন বন্দোবস্ত করতে পারছি নে। দুটো গান বা গুজব, হাসি বা তামাশা, এর চেয়ে বেশি আর কিছু হয়ে উঠল না। যারা প্রত্যাশা করেছিল তারা মাঝের থেকে আমারই উপর চটবে। কিন্তু কে তাদের মাথার দিব্যি দিয়ে প্রত্যাশা করতে বলেছিল! হঠাৎ একদিন বৈশাখের প্রভাতে নববর্ষের নূতন পত্র পুষ্প আলোক ও সমীরণের মধ্যে জেগে উঠে যখন শুনলুম আমার বয়স সাতাশ তখন আমার মনে এই-সকল কথার উদয় হল। আসল কথা— যতদিন আপনি কোনো লোককে বা বস্তুকে সম্পূর্ণ না জানেন ততদিন কল্পনা ও কৌতূহল মিশিয়ে তার প্রতি একপ্রকার বিশেষ আসক্তি থাকে। পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত কোনো লোককে সম্পূর্ণ জানা যায় না— তার যে কী হবে, কী হতে পারে কিছুই বলা যায় না; তার যতটুকু সম্ভূত তার চেয়ে সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু সাতাশ বৎসরে মানুষ একরকম ঠাহর করা যায়— বোঝা যায় তার যা হবার তা একরকম হয়েছে, এখন থেকে প্রায় এইরকমই বরাবরই চলবে, এ লোকের জীবনে হঠাৎ আশ্চর্য হবার আর কোনো কারণ রইল না। এই সময়ে তার চার দিক থেকে কতকগুলো লোক

ঝরে যায়, কতকগুলো লোক স্থায়ী হয়– এই সময়ে যারা রইল তারাই রইল। কিন্তু আর নূতন প্রেমের আশাও রইল না, নূতন বিরহের আশঙ্কাও গেল। অতএব এক রকম মন্দ নয়। জীবনের আরামজনক স্থায়িত্ব লাভ করা গেল। আপনাকেও বোঝা গেল এবং অন্যদেরও বোঝা গেল। ভাবনা গেল।

আজকাল আমাদের এখানে বর্ষা পড়েছে। ঘন মেঘ ও অবিরাম বৃষ্টি। এই সময়ই তো বন্ধুসংগমের সময়। এই সময়টা ইচ্ছে করছে, তাকিয়া আশ্রয় করে পড়ে পড়ে যা-তা বকাবকি করি। বাইরে কেবল ঝুপ্ ঝুপ্ বৃষ্টি, ঝন্ ঝন্ বজ্র, হু হু বাতাস এবং রাজপথে সেক্‌রা গাড়ির জীর্ণ চক্রের কদাচিৎ খড়্ খড়্ শব্দ। ইংরাজ-রাজের উপদ্রবে তাও ভালো করে হবার জো নেই– ইংরাজ-রাজত্বে বজ্র বৃষ্টি বাতাস এবং সেক্‌রা গাড়ির অভাব নেই, কিন্তু এই রাক্ষসী তার দেশ-বিদেশ-ব্যাপী অফিস আদালত প্রভৃতি বদন ব্যাদান-পূর্বক তাকিয়ার কোমল কোল শূন্য ক'রে আমাদের গোটা গোটা বন্ধুবান্ধবদের গ্রাস করে ফেলছে; এই ভরা বাদরে আমাদের মন্দির হাহাকার করছে। 'আষাঢ়ে গল্প'-নামক আমাদের একটি নিতান্ত দেশজ পদার্থ অন্যান্য সহস্র দেশজ শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাবার উপক্রম করছে। আমাদের সেই বহুপুরাতন আষাঢ় সহস্র দালান ও চণ্ডীমণ্ডপের চক্ষের সম্মুখে অবিশ্রাম কেঁদে মরছে, কিন্তু তার আষাঢ়ে গল্প নেই। আমাদের সেই শত শত গান গল্প সাহিত্য-চর্চার স্মৃতিতে ও তুলোতে পরিপূর্ণ তাকিয়াই বা কোথায়, আমিই বা কোথায়, এবং আপনিই বা কোথায়! যদুপতিই বা কোথায়, মথুরাপুরীই বা কোথায়! অতএব, হে বন্ধুবর–

ইতি বিচিন্ত্য কুরু স্বমনস্থিরং
ন সদিদং জগদিত্যবধারয়।

এই আমার চিঠির moral, তত্ত্ব, উদ্দেশ্য–অতএব কেবল এইটুকু গ্রহণ করে বাকিটুকু বাদ দেবেন, কিন্তু চট্‌পট্ উত্তর দিতে ভুলবেন না।

আপনার বিশেষরূপে মনে থাকবে বলে এই চিঠির কিয়দংশ পদ্যে অনুবাদ করে পাঠাই, অবধান করা হউক।

বন্ধু হে,
পরিপূর্ণ বরষায়
আছি তব ভরসায়
কাজকর্ম করো সায়—
এসো চট্‌পট্।